Vol. 60 | No. 3 | 2025

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

# কাজী নজরুল ইসলামের গদ্যে শব্দের দ্ব্যর্থবোধক ব্যবহার

| | |
|---|---|
| Volume | 60 |
| Issue | 3 |
| Year | 2025 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | Tariq Manzoor |
| Published online | November 30, 2025 |
| DOI | 10.62328/sp.v60i3.2 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v60i3.2 |
| Pages | 23-41 |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

Check for updates

মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ

# সাহিত্য পত্রিকা

Journal.bangla.du.ac.bd
Print ISSN: 0558-1583
Online ISSN: 3006-886X
বর্ষ: ৬০ সংখ্যা: ৩
আষাঢ় ১৪৩২॥ জুন ২০২৫
প্রকাশকাল: নভেম্বর ২০২৫
Issue DOI: DOI: 10.62328/sp.v60i3

DOI: 10.62328/sp.v60i3.2
প্রবন্ধ জমাদান: ২০ এপ্রিল ২০২৫
প্রবন্ধ গৃহীত: ২২ জুন ২০২৫
পৃষ্ঠা: ২৩-৪১

## কাজী নজরুল ইসলামের গদ্যে শব্দের দ্ব্যর্থবোধক ব্যবহার

**তারিক মনজুর**
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: t.manzoor707@gmail.com

### সারসংক্ষেপ

একাধিক অর্থ প্রকাশের ক্ষমতা শব্দের সহজাত বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতপক্ষে শব্দের নিজের অর্থ প্রকাশের ক্ষমতা থাকে না; বাক্যের পরিপ্রেক্ষিতে শব্দের অর্থ তৈরি হয়। আবার একই শব্দ বা শব্দগুচ্ছ প্রয়শ বাক্যে একাধিক অর্থ প্রকাশ করে। বিশেষত কাব্যভাষায় এটি প্রবলভাবে দেখা যায়। কাজী নজরুল ইসলামের গদ্যভাষাতেও প্রচুর পরিমাণে দ্ব্যর্থবোধক শব্দের ব্যবহার রয়েছে। নজরুল কবি ছিলেন বলেই এই প্রবণতা দেখা যায়। তবে বিশ শতকের ব্রিটিশ উপনিবেশিত সমাজবাস্তবতাও এই সঙ্গে খেয়াল রাখা দরকার; যে কারণে তাঁকে সচেতনভাবেই দ্ব্যর্থবোধক শব্দের আশ্রয় নিতে হয়েছে। এই লেখায় নজরুলের প্রবন্ধ থেকে এ ধরনের দ্ব্যর্থবোধক শব্দ অনুসন্ধান করা হয়েছে এবং সেসব শব্দের শ্রেণি ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবেই শব্দের উৎস ও দ্বিবিধ অর্থ নির্দেশ করা হলো। এ ছাড়া বিষয় ও ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে এসব শব্দের প্রয়োগ কতটুকু কার্যকর হয়েছে, উপান্তে তা মূল্যায়ন করে দেখা হলো। এই প্রবন্ধে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের অর্থ-বিশ্লেষণ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

### মূলশব্দ

দ্ব্যর্থবোধক শব্দ, বাংলা গদ্য, শব্দগুচ্ছ, শব্দের অর্থ, বিশিষ্ট অর্থ, ভাষা ও সমাজ, নজরুল চরিতমানস।

## ১ ভূমিকা

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) মূলত কবি; তাঁর প্রবল সাহিত্যিক স্ফুরণ ঘটেছে কবিতা ও গানে। নজরুলের গদ্য-রচনায় তাঁর এই কবি-স্বভাবের বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রবলভাবে লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে অনুপ্রাস-অলংকারযুক্ত শব্দ তিনি গদ্যভাষাতেও পৌনঃপুনিকভাবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর প্রবন্ধ বক্তব্য প্রকাশের দিক থেকে সুনির্দিষ্ট; কিন্তু প্রবন্ধের ভাষা প্রায় ক্ষেত্রেই কাব্যিক। অনেক ক্ষেত্রে প্রবন্ধে তিনি এমনভাবে উদ্দিষ্ট বিষয় উপস্থাপন করেছেন, যা সাধারণ অর্থ ছাপিয়ে বিশেষ অর্থ গ্রহণ করে। মূর্ত বা বস্তু-প্রকাশক শব্দ প্রায়শ বির্মূর্ত বা ভাবপ্রধান শব্দে পরিণত হয়েছে। তা ছাড়া, কবিতার মতো গদ্যভাষাতে তিনি এমন অসংখ্য শব্দ ব্যবহার করেছেন যেগুলো একের বেশি অর্থ জ্ঞাপন করে। এসব বিশিষ্ট শব্দের শ্রেণি ও বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে নজরুলের গদ্যভাষার প্রবণতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে। একই সঙ্গে এ জাতীয় দ্ব্যর্থবোধক শব্দের উৎস ও অর্থ নির্দেশের মাধ্যমে কাজী নজরুল ইসলামের চরিতমানস উপলব্ধি করা যেতে পারে।

কাজী নজরুল ইসলামের প্রবন্ধগ্রন্থ তিনটি: *যুগবাণী* (১৯২২), *দুর্দিনের যাত্রী* (১৯২৬) ও *রুদ্র-মঙ্গল* (১৯২৭)।[১] এ ছাড়া 'ধূমকেতু'র মামলায় আদালতে পেশ করা বক্তব্য পরে 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' (১৯২২) নামে প্রকাশিত হয়। *যুগবাণী* প্রবন্ধগ্রন্থে ১৭টি, *দুর্দিনের যাত্রী* গ্রন্থে ৭টি এবং *রুদ্র-মঙ্গল* গ্রন্থে ৮টি প্রবন্ধ রয়েছে। দ্ব্যর্থবোধক শব্দ অনুসন্ধানের কাজে এই তিনটি গ্রন্থের ৩২টি প্রবন্ধ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত *নজরুল রচনাবলীর* প্রথম খণ্ড (১৯৯৩)। শব্দ তালিকা করার সময়ে প্রবন্ধ-ক্রম অনুযায়ী না রেখে আভিধানিক ক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে।

## ২ দ্ব্যর্থবোধক শব্দ

যেসব শব্দ একটি বাক্যে একইসঙ্গে দুই রকম অর্থ জ্ঞাপন করে সেগুলোকে দ্ব্যর্থবোধক শব্দ বলে। এ ধরনের শব্দ একই বাক্যে কখনো কখনো দুইয়ের বেশি অর্থ জ্ঞাপন করতে পারে। দ্ব্যর্থবোধক শব্দের উপস্থিতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার আগের বা পরের বাক্যটির অর্থকেও প্রভাবিত করে। লেখকের ভাষা-দক্ষতায় বাক্যে দ্ব্যর্থবোধক শব্দের প্রয়োগ ঘটে। কখনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, কখনো উদ্দেশ্য ছাড়াই এসব শব্দের প্রয়োগ হয়। উদ্দেশ্যযুক্ত প্রয়োগে শব্দটি বিষয়গত অর্থপ্রকাশে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। আর উদ্দেশ্যবিহীন প্রয়োগে ভাষার নান্দনিকতা বাড়ে।

Jia-Fei Hong দ্ব্যর্থবোধক শব্দ সম্পর্কে বলেন:

> Lexical ambigutiy and polysemy both indicate vague, unclear, and indefinite senses; that is to say, lexically ambiguous words and polysemous words can refer to more than two senses at the same time. Because thery are so similar, it is necessary to define lexical ambiguity and polysemy as accurately as possible. (Hong, 2014: 10)

Sandeep Kumar শব্দের দ্ব্যর্থবোধকতা সম্পর্কে বলেন:

> One of the aspects of how meaning works in language most in semantics, is *ambiguity. Lexical ambiguty* is when a sentence can be can have two or more possible meanings, due to polysemous words (i. e. words that have two or more related meanings) or homophonous words (a single word which has two or more different meanings). A sentence is *structurall ambiguous* if it can have two or more possible meanings, due to the words it contains being able to be combined in differnet ways which create different meanings. (Kumar, 2020: 2.134)

শব্দের অর্থ স্থির নয়; এমনকি বাক্যে প্রয়োগের পরেও। কারণ, উচ্চারণ ও স্বন ভিন্নতার কারণে অর্থ বদলে যেতে পারে। আবার সাধারণ কথোপকথনে বাক্যের একটি শব্দ সাধারণত একটি অর্থই জ্ঞাপন করে। তবে, বাক্‌চাতুর্যে শব্দের একাধিক অর্থ তৈরি করা সম্ভব।

কবিতার ভাবব্যঞ্জনায় ধ্বনির প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। সন্‌জীদা খাতুন বলেন—

> ধ্বনিক্রমের সঙ্গে অর্থপূর্ণ শব্দাবলীর সম্পর্কের কথাও স্মরণ রাখা দরকার। মানবভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনি আর অর্থের ভিতরে দিনে দিনে বহুমাত্রিক সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। T S Eliot এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, শ্রুতিগত কল্পনা (auditory imagination) ব্যাপারটি হচ্ছে বোধের সাহায্যে সিলেব্‌ল আর ছন্দের সন্ধান। চিন্তা আর বোধের চেতন স্তর ভেদ করে ঢের গভীরে চলে গিয়ে এই সন্ধান প্রতিটি শব্দকে সঞ্জীবিত করে। (২০২৩: ২৫)

কাজী নজরুল ইসলাম গদ্যভাষায় ধ্বনির ব্যঞ্জনা তৈরি করে ভাবপ্রকাশের সুযোগ নিয়েছেন। ধ্বনির সঙ্গে অর্থের একটা ভাবগত সম্পর্ক শব্দসৃষ্টির সঙ্গেই সম্পর্কিত। প্রথাগত ব্যাকরণে যদিও বলা হয়, ধ্বনির কোনো অর্থ নেই। তাহলে প্রশ্ন, শব্দের পর্যায়ে গিয়ে অর্থ-সংশ্লিষ্টতা তৈরি হয় কি না, যেমনটি প্রথাগত ব্যাকরণ বলে থাকে। কিন্তু সূক্ষ্মতর ভাবনা থেকে বোঝা যায়, প্রকৃতপক্ষে শব্দেরও কোনো অর্থ নেই, তা কোনো বস্তু বা ভাবের নির্দেশন বা ধারণামাত্র। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, আমরা যখন কোনো শব্দের কথা ভাবি, তখন আমরা কোনো ধারণার কথা ভাবি, আর যখন কোনো ধারণার কথা ভাবি, তখন আমরা কোনো শব্দের কথা ভাবি (হুমায়ুন ১৯৯৯:৩২-৩৪)।

কলিম খান শব্দ ও অর্থের সম্পর্কের মধ্যে দ্বিধাকে দেখেছেন পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানের পণ্ডিতি সংশয় হিসেবে। তিনি লিখেছেন:

> শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক কি না, আদি বাংলায় তেমন কোনো সংশয় ছিল না, যে সংশয় আদি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। আদি বাংলায়, এক বা একাধিক বর্ণ মিলে কেবল শব্দই তৈরী করত না, তার অর্থকেও ধারণ করতো। অর্থের সংবাদ নেবার জন্য শব্দের বাইরে যেতে হত না, শব্দের ভিতরে তাকালেই চলতো। কেননা শব্দার্থ বেরোতো শব্দের ভিতর থেকে, তার ব্যুৎপত্তি দেখে। সেখানে থাকতো একটি ক্রিয়ার কথা। সেই ক্রিয়ার সম্পাদনকারীই ছিল শব্দের উদ্দিষ্ট। ফলে শব্দমাত্রই

> ছিল বহুরৈখিক। সেই কারণে, শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক ছিল স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক, দেহের সঙ্গে আত্মার সম্পর্কের মতো। (২০০১: ৩৬)

পাশ্চাত্য সাংগঠনিক ভাষাবিশ্লেষণ-পদ্ধতিতে শব্দের অর্থকে তার গঠনের মতো মূর্তমান করে দেখানো হয়। কোনো ধ্বনির বৈশিষ্ট্য নিরূপণের জন্য সেটিকে যেমন বৈশিষ্ট্য-ছাঁচে বা বৈশিষ্ট্য-ছকে ফেলা যায়, তেমনি শব্দের ক্ষেত্রেও উপাদান বিশ্লেষণের মাধ্যমেও তার আর্থ-বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যেতে পারে। তবে, এভাবে নির্দেশিত অর্থ কোনো শব্দের চূড়ান্ত অর্থ নাও হতে পারে; কারণ বাক্যে প্রয়োগের উপরই তার যথার্থ অর্থ নিরূপিত হয়। (Leech 1974: 123-134)

আবার একটি শব্দ বাক্যে ব্যবহারগত পার্থক্যের কারণে ভিন্ন ভিন্ন অর্থপ্রকাশক হতে পারে। জিওফ্রে লিচ (১৯৭৪) এ রকম সাত রকম অর্থের কথা বলেন। এর মধ্যে রয়েছে: ধারণাগত অর্থ, ভাবগত অর্থ, শৈলীগত অর্থ, অনুভূতিগত অর্থ, প্রতিফলিত অর্থ, সহাবস্থানিক অর্থ ও বক্তব্যগত অর্থ (হুমায়ুন ১৯৯৯: ২৪-২৯)। একটি শব্দের আর্থ-বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে তার ধারণাগত অর্থ তৈরি হয়। এটি প্রথাগত ব্যাকরণ অনুসারে মুখ্য অর্থ বা বাচ্যার্থ বলা যেতে পারে। বাক্যে প্রয়োগের আগেই এ ধরনের অর্থ ধারণা করা যায়। কিন্তু অপরাপর অর্থের শ্রেণিভাগের সাথে বাক্যে প্রয়োগ-বৈচিত্র্য গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, 'নারী' ও 'ললনা' ধারণাগতভাবে একই অর্থ প্রকাশক হলেও ভাবগত অর্থ এদের আলাদা। তাছাড়া লেখকভেদে শব্দের শৈলীগত প্রয়োগ-ভিন্নতা দেখা যাওয়াই স্বাভাবিক; কাজী নজরুল ইসলামের শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নিজস্ব ধরন দেখা যাবে।

স্টিফেন উল্‌ম্যান শব্দের অর্থের সঙ্গে এর মূল ও গঠনগত রূপকে সম্পর্কিত করতে চান—

> ভাষাঘাটত বিজ্ঞানের ত্রিমাত্রিক মডেলে শাব্দাথিক পরিবর্তনকে রূপতাত্ত্বিক পরিবর্তন-এর প্রতিরূপ (counterpart) হিসেবে পাওয়া যায়, অথচ ধ্বনি-পরিবর্তনের কোনো শাব্দাথিক প্রতিপক্ষ নেই, যেহেতু ধ্বনির কোনো অর্থ নেই। রূপতাত্ত্বিক ও শাব্দার্থিক—উভয়বিধ পরিবর্তনই শব্দমূল (word-stem) ও শব্দগঠন (word-formation)-কে প্রভাবিত করে; এবং এই সমান্তরালতা বাক্যপ্রকরণেও অনুসরণ করা যেতে পারে। তবে এই প্রতিসাম্য সারগত ততোটা নয়, যতোটা নৈর্মিতিক। (১৯৯৩: ২১১)

সেদিক থেকে বলা যায়, নজরুলের সমৃদ্ধ শব্দভান্ডার ছিল এবং একেকটি শব্দকে তিনি নতুন কাঠামোয় ও রূপে ব্যবহার করতে পারতেন। শব্দ এ কারণে তাঁর বহুবিধ অর্থপ্রকাশক উপাদান হয়ে উঠতে পেরেছে।

### ৩ গ্রন্থনাম ও প্রবন্ধের শিরোনামে দ্ব্যর্থবোধক শব্দ

কাজী নজরুল ইসলামের প্রবন্ধ গ্রন্থের নাম ও প্রবন্ধের শিরোনামে দ্ব্যর্থবোধক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। *যুগবাণী, দুর্দিনের যাত্রী* ও *রুদ্র-মঙ্গল*—তিনটি প্রবন্ধগ্রন্থের নামই দ্ব্যর্থবোধক শব্দযুক্ত।

'যুগবাণী' শব্দটির সাধারণ অর্থ—কালের কথা। নজরুল ১৯২০ সালে সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগে' যেসব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন, মূলত সেগুলোই এখানে গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে। তাই 'যুগবাণী'

শব্দের অন্তত আরেকটি অর্থ তৈরি হয়েছে—'নবযুগ' পত্রিকার বাণী বা বক্তব্য। তা ছাড়া এই নামে 'নতুন যুগের বাণী' কিংবা 'যুগ পরিবর্তনের বাণী'—এ রকম অর্থেও গ্রহণ করা যায়।

কাজী নজরুলের কাল ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশের কাল। ফলে, দ্বিতীয় প্রবন্ধগ্রন্থ 'দুর্দিনের যাত্রী' নামের মধ্যে আছে দুঃসময়ের পথিক এবং বিপ্লবী অভিযাত্রী—দুই রকম ব্যঞ্জনা। উপনিবেশিত জনগণ যে দুঃসময় পার করছে, সেই দুঃসময়ে নজরুল তাদের সহযাত্রী হয়ে গমন করতে চান। এখানে 'দুর্দিন' ও 'যাত্রী' দুটি শব্দই সাধারণ অর্থের বাইরে কাব্যিক ও বিশেষায়িত অর্থকেই মূলত ধারণ করছে।

তৃতীয় প্রবন্ধগ্রন্থের 'রুদ্র-মঙ্গল' কেবল শিবকে নির্দেশ করছে না, ধ্বংসের মধ্য দিয়ে নতুন কল্যাণময় সৃষ্টির কথাও বলছে। নজরুল বিদ্যমান প্রথা ও ব্যবস্থাকে ভেঙে নতুন যে পৃথিবী তৈরি করতে চান, সেখানে রুদ্র বা শিব মঙ্গল হয়ে দেখা দেবে।

এই তিনটি গ্রন্থের প্রবন্ধগুলোর শিরোনামেও অনেক ক্ষেত্রে দ্ব্যর্থবোধকতা লক্ষণীয়। যেমন: 'নবযুগ', 'জাগরণী', 'আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল', 'তুর্‌ড়ি বাঁশির ডাক', 'মোরা সবাই স্বাধীন: মোরা সবাই রাজা', 'পথিক! তুমি পথ হারাইয়াছ?', 'আমি সৈনিক', 'আমার পথ', 'বিষ-বাণী', 'ধূমকেতুর পথ' ইত্যাদি।

## ৪ কাজী নজরুলের কাল এবং প্রবন্ধ রচনার স্ফুরণ

কাজী নজরুল ইসলামের গদ্যরচনার বিষয়ের সঙ্গে কালগত সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর বেশির ভাগ প্রবন্ধে যে কারণে উপনিবেশবিরোধী মনোভাব প্রবলভাবে ব্যক্ত হয়েছে। তা ছাড়া তিনি সৈনিক জীবন থেকে কলকাতায় ফিরে 'নবযুগ'[২] পত্রিকায় কাজ করার সুযোগ পান। পত্রিকার সম্পাদকীয় লেখার সূত্রেই তাঁকে প্রবন্ধ লিখতে হয়। এসব প্রবন্ধ প্রবলভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, তারুণ্যের দায় ও দায়িত্ব, শিক্ষা ও সাহিত্য ভাবনা, অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে অবস্থান ইত্যাদি নজরুলের লেখায় প্রাধান্য পায়। নজরুল 'নবযুগে' যোগদানের কিছুদিনের মধ্যেই পত্রিকাটি সারা দেশে আলোড়ন তৈরি করে। এর পেছনে অন্তত দুটি ব্যাপার কাজ করেছে: ভাবপ্রকাশের ব্যাপারে নজরুল ছিলেন স্পষ্ট এবং তাঁর গদ্যভাষাও ছিল কাব্যিক এবং রসালো। এ প্রসঙ্গে খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন:

> চার পৃষ্ঠার কাগজ—কিন্তু আগুন! নজরুলের যোগদানের কয়েক দিনের মধ্যেই 'নবযুগ' সারা বাংলাদেশে নবযুগের সৃষ্টি করে। তাঁর বলিষ্ঠ ভাষা আর সংবাদ-পরিবেশনের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে মেতে ওঠে জনসাধারণ। ভীরু বাংগালীর কলম-যে পাঠকমনে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে, 'নবযুগে' নজরুলের যোগ দেওয়ার আগে এ-কথা কেউ ভাবতে পারে নাই। তাঁর ভাষার গতি ছিল প্রবহমান, বর্ণনার ভংগি ছিল উচ্ছল আর বেগবতী। আর একটা অতি সাধারণ সংবাদও এমন রসালো করে পরিবেশন করা হতো যার ফলে অতি সাধারণ পাঠকের মনও আনন্দ-চঞ্চল না হয়ে পারতো না। সবচেয়ে আনন্দদায়ক হতো তাঁর হেডিংগুলা, আর সংবাদ-শেষে একটি শব্দ বা একটি বাক্যে মন্তব্য-প্রকাশে। (১৯৭৮: ১৬)

নজরুলের বাল্যজীবনের বর্ণনা তুলে ধরে খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন আরো লিখেছেন, নজরুলের কাব্যশক্তি ছিল স্রষ্টা-প্রদত্ত (১৯৭৮: ১৫)। বাল্যকালেই কাব্যচর্চায় হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর, এবং এই ধারা বহমান ছিল। তাছাড়া নজরুল পাঠ্য বইয়ের চেয়ে বাইরের বই পড়তেন বেশি। যে কারণে মিথ-পুরাণের প্রজ্ঞা এবং অন্যান্য জ্ঞান তাঁর ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে।

## ৫.১ নজরুলের গদ্যে সাধারণ দ্ব্যর্থবোধক শব্দ

দ্ব্যর্থবোধক শব্দের প্রয়োগ বাংলা কবিতায় প্রবলভাবে দেখা যায়। কাজী নজরুল ইসলামের গদ্যেও প্রচুর দ্ব্যর্থবোধক শব্দ রয়েছে। এসব প্রয়োগ থেকে বোঝা যায়, কবি-নজরুল কীভাবে প্রাবন্ধিক-নজরুলকে অভিব্যাপ্ত করে রেখেছে। কাজী নজরুল ইসলামের গদ্যভাষায় এক ধরনের আবেগ, পৌরুষ ও বলিষ্ঠতা রয়েছে। সুশীলকুমার গুপ্ত মনে করেন—

> নজরুলের প্রবন্ধগুলি মননশীলতার অভাবহেতু অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ এবং উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও রূপকে কণ্টকিত। তবে তাঁর ভাষার পৌরুষ ও অকৃত্রিম ভাবাবেগ অনেকস্থলেই চমকৃত হতে হয়। অনেক প্রবন্ধ সংবাদপত্রের তাগাদা মেটানোর জন্যে রচিত ব'লে সময়াভাবে অযত্নবিন্যস্ত। তাঁর ভাষার পৌরুষ অনেক ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের গদ্যরচনাকে মনে না করিয়ে দিয়ে পারে না। ... নজরুলের কোনো কোনো রচনা অবাঞ্ছিতমাত্রায় প্রচারমূলক। এ সব সত্ত্বেও নজরুলের কয়েকটি রচনা তাঁর ব্যক্তিমানসের দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনসমালোচনার জন্যে মূল্যবান। তাই এক বিশেষ ধরনের আবেগ ও পৌরুষসমন্বিত গদ্যপ্রণয়নে তাঁর স্থান উপেক্ষণীয় নয়। (১৯৯৭: ২৮৭)

সুশীলকুমার অবশ্য নজরুলের গদ্যভাষায় ভালো-মন্দ দু রকম গুণই প্রত্যক্ষ করেছেন:

> 'নজরুলের রচনার সবচেয়ে বড় ত্রুটি মননশীলতার স্বল্পতা ও শিল্পসৌষ্ঠব সম্পর্কে আবেগপ্রাবল্যজনিত উদাসীনতা ও অসতর্কতা। তাঁর রচনার শ্রেষ্ঠ গুণ যৌবনধর্ম, অন্তর্মুখী ভাবাবেগের অকৃত্রিমতা ও কাব্যধর্মী ওজস্বিতা। ... প্রধানতঃ সাংবাদিকতার উদ্দেশ্যে রচিত হলেও নজরুলের কতকগুলি প্রবন্ধ যে সাময়িকতার গণ্ডি পেরিয়ে আজও টিকে আছে তাতে অবশ্যই তাদের সাহিত্যগুণের অভ্রান্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা, রবার্ট লিন্ড (Robert Lynd) বলেছেন, 'Literature is journalism that lasts.' (১৯৯৭: ২৮৭)

আবেগের প্রাবল্য ও কাব্যধর্মী ওজস্বিতা কাজী নজরুল ইসলামের শব্দকে দ্ব্যর্থবোধক করতে সহায়তা করেছে। নিচে নজরুলের প্রবন্ধ থেকে দ্ব্যর্থবোধক শব্দের তালিকা উপস্থাপন করা হলো। নির্বাচিত শব্দের পাশে সেটির প্রয়োগবাক্য, বন্ধনিতে তার উৎস-প্রবন্ধের নাম, এবং শেষে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শব্দের দ্বিবিধ অর্থ নির্দেশ করা হয়েছে।

> অণু-পরমাণু: নিখিল মানবের অণু-পরমাণু ক্ষিপ্ত হইয়া সাড়া দিয়াছে ('নবযুগ')। শব্দের সাধারণ অর্থ: ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। বিশেষ অর্থ: নিপীড়িত জনগণ।

> আত্মা: তাহার আত্মা তোমার আত্মার মতোই ভাস্বর ('উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন')। 'আত্মা' এখানে একইসঙ্গে প্রাণ এবং প্রবণতাকে বোঝাচ্ছে।

আরাম-কেদারা: ত্যাগ কখনো আরাম-কেদারায় শুইয়া হয় না ('গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!')। সাধারণ অর্থ: সুখে দিন কাটানো। কিন্তু প্রবন্ধে নির্লিপ্ত থাকা বোঝানো হচ্ছে।

উদার: যাঁহার প্রাণ যত উদার, যত উন্মুক্ত, তিনি তত বড়ো সাহিত্যিক ('বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান')। 'উদার' শব্দটি এখানে একাধিক অর্থ জ্ঞাপন করে—ধর্ম, দেশ ও জ্ঞানের সব ধরনের সংকীর্ণতামুক্ত গুণকে বোঝানো হচ্ছে।

ঊর্ধ্ব: সে ঊর্ধ্বে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল ('মন্দির ও মসজিদ')। এখানে 'ঊর্ধ্ব' শব্দটি দিয়ে উপর দিক এবং বিধাতা উভয়ই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

কালাপাহাড়: কালাপাহাড়ের দলকে সেই জন্য আমরা আজ প্রাণ হইতে আবাহন করিতেছি ('ছুঁৎমার্গ')। কালাপাহাড় দল বলতে এখানে কররানি রাজবংশের দুর্ধর্ষ সিপাহসালারের সেনাদের বোঝানো হচ্ছে। একইসঙ্গে নজরুলের সমকালের দুঃসাহসী, বিধ্বংসী তরুণদেরও বোঝানো হচ্ছে।

ছোঁয়া-ছুঁয়ি: এই ছোঁয়া-ছুঁয়ির জঘন্য ব্যাপারটাই ('ছুঁৎমার্গ')। এটি একইসঙ্গে স্পর্শ এবং স্পর্শজনিত সামাজিক ধারণা—উভয় বিষয়কে প্রকাশ করছে।

ছোটোলোক: এই 'ছোটোলোক' এমন স্বচ্ছ অন্তর, এমন সরল মুক্ত উদার প্রাণ লইয়াও যে কোনো কার্য করিতে পারিতেছে না, তাহার কারণ ... ('উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন')। দরিদ্র, নিপীড়িত শ্রমিক শ্রেণির লোকদের বোঝাতে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

ঝোরা: অশ্রুর শত পাগল-ঝোরা ছুটিল ('নবযুগ')। সাধারণ অর্থ: ঝরনা। এখানে কান্নার বেগ বোঝানো হয়েছে।

দেওয়াল: তোমর বন্ধন ওই সামনের দেওয়ালকে ভাঙ্গিতে হইলে একেবারে তাহার ভিত্তিমূলে শাবল মারিতে হইবে ('ভাব ও কাজ')। 'দেওয়াল' শব্দটি দিয়ে শোষক এবং শাসন—দুটি অর্থই বোঝানো হচ্ছে।

ধূমকেতু: 'ধূমকেতু' হবে আগুনের সম্মার্জনা! ('আমার পথ')। মহাকাশের ধূমকেতু ব্রিটিশদের জন্য অমঙ্গলের প্রতীক, একইসঙ্গে ধূমকেতু পত্রিকাটিও তাদের জন্য অমঙ্গলের বার্তা নিয়ে আসবে—দুই অভিপ্রায় থেকেই শব্দটির প্রয়োগ ঘটেছে।

ধ্বংস: তোমরা মরিতেছ, তোমরাই ধ্বংসের পথে চলিয়াছ! ('কালা আদমীকে গুলি মারা')। 'ধ্বংস' একইসঙ্গে বিনাশ, ক্ষতিসাধন এবং ক্ষমতাহারানো অর্থ প্রকাশ করছে।

ন্যাজ: ভিতরের ন্যাজকে কাটবে কে? ('হিন্দু-মুসলমান')। 'ন্যাজ' শব্দটি দিয়ে মুখ্যত লেজ এবং গৌণত বৈশিষ্ট্য, মনোভাব ইত্যাদি অর্থ বোঝাচ্ছে।

বড়ো লোক: এবার খুব বড়ো লোকের ঘরে জন্মায় যেন ('মন্দির ও মসজিদ')। 'বড়ো লোক' শব্দগুচ্ছ দিয়ে ধনী ও সহৃদয় উভয় অর্থ বোঝানো হয়েছে।

বিশ্ব-জননী: তাহার কণ্ঠে যেন বিশ্ব-জননী কাঁদিয়া উঠিল ('মন্দির ও মসজিদ')। এখানে 'বিশ্ব-জননী' বিশেষ অর্থে বিধাতাকে নির্দেশ করছে।

ভদ্রলোক: আভিজাত্যগর্বিত তোমাদের 'ভদ্রলোকের' অন্তর মসীময় অন্ধকার ('উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন')। 'ভদ্রলোক' শব্দটি সমাজের অর্থনৈতিকভাবে বিত্তশালী এবং একইসঙ্গে 'উচ্চবংশে' জন্মগ্রহণকারী মানুষদের বোঝানো হয়েছে।

মহাজাগরণ: আজ মহাবিশ্বে মহাজাগরণ ('নবযুগ')। শব্দটির প্রয়োগ দিয়ে নিদ্রিত ভারতবাসীর জাগ্রত হওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে; একইসঙ্গে ভারতবাসীর প্রতিবাদী অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে।

মা: যারা চোখের সামনে মায়ের অপমান দেখে শুধু ক্রন্দন করে ('রুদ্র-মঙ্গল')। এখানে 'মা' শব্দটি দেশ অর্থবোধক।

মাখন: আমাদের গায়ের দাগগুলো কি এমন করিয়া মাখন ডলিলে এত শীঘ্র মিলাইয়া যাইবে? ('লাট-প্রেমিক আলি ইমাম')। এখানে মাখন শব্দটি সাধারণ অর্থের বাইরেও ভিন্নতর ব্যঞ্জনা তৈরি করেছে।

মানুষ: প্রথমে আমাদিগকে মানুষ হইতে হইবে ('জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়')। 'মানুষ' শব্দটি এখানে নিঃস্বার্থ, উদার ও মানবিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তি বোঝাচ্ছে।

মুক্তি: মুক্তিলাভের জন্য প্রাণ লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছে ('গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!')। এই 'মুক্তি' শব্দ একইসঙ্গে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, আর্থিক সচ্ছলতা, মতপ্রকাশের শক্তি ইত্যাদি বহুবিধ অর্থ প্রকাশ করছে।

যাত্রা: আজ আমাদের নূতন করিয়া যাত্রা শুরু ('সত্য-শিক্ষা')। শব্দটি এগিয়ে চলা ও বিপ্লব দু রকম অর্থই বহন করছে।

যাত্রী: ধীরে ধীরে পিছনে চলেছে তেত্রিশ কোটি আঁধারের যাত্রী ('রুদ্র-মঙ্গল')। 'যাত্রী' শব্দ দিয়ে অধিবাসী এবং পরাধীন প্রজা বোঝানো হচ্ছে।

রাজা: একবার শির উঁচু করে বল দেখি বীর, 'মোরা সবাই স্বাধীন, সবাই রাজা!' ('মোরা সবাই স্বাধীন মোরা সবাই রাজা')। 'রাজা' শব্দটি আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি ও স্বাধীন প্রজা বোঝাচ্ছে।

রাত্রি: নিশীথ রাত্রি। সম্মুখে গভীর তিমির ('রুদ্র-মঙ্গল')। 'রাত্রি' শব্দটি একইসঙ্গে দিবাবসান ও দুর্যোগের কাল নির্দেশ করছে।

সত্য: তুমি মানুষ—তুমি সত্য ('ছুঁৎমার্গ')। এখানে 'সত্য' শব্দের মধ্য দিয়ে মানুষের বিভিন্ন ইতিবাচক গুণের সমন্বয় বোঝানো হয়েছে। ফলে, 'সত্য' শব্দটি এখানে বহু অর্থ ধারণ করছে।

সাধনা: আমাদের সাধনা, আমাদের অনুপ্রাণতা এক নিমিষে উঠিয়াই থামিয়া যায় ('আমাদের শক্তি স্থায়ী হয় না কেন?')। এখানে 'সাধনা' বলতে সংকল্প ও আন্দোলন দুটি অর্থই বোঝানো হয়েছে।

সাপুড়ে: তাহাকে দস্তুরমতো সাপুড়ে হওয়া চাই ('ভাব ও কাজ')। শব্দটি সাধারণ অর্থের বাইরেও বিশেষ অর্থে 'উপযুক্ত নেতা' ও 'কৌশলী ব্যক্তি'র প্রতিনিধিত্ব করছে।

সাহেব: সাহেবের দোকানের জিনিসের দাম ('বাঙালির ব্যবসাদারী')। 'সাহেব' এখানে বিদেশি এবং ইংল্যান্ডের অধিবাসী—দুই রকম অর্থই জ্ঞাপন করছে।

সিংহ: প্রকারান্তরে লর্ড সিংহকেই গাল দেওয়া হইবে ('শ্যাম রাখি না কুল রাখি')। 'সিংহ' শব্দটি একইসঙ্গে সাধারণ অর্থে পরাক্রমশালী এবং ব্যাঙ্গার্থে কাপুরুষ অর্থ ধারণ করেছে।

সৈনিক: দেশ-উদ্ধারের জন্য যারা সৈনিক হতে চায় ('ধূমকেতুর পথ')। 'সৈনিক' এখানে বিপ্লবী ও যোদ্ধা অর্থে ব্যবহৃত।

## ৫.২ ধর্ম, ধর্মীয় বিষয় ও মিথ-পুরাণের ব্যবহারে দ্ব্যর্থবোধকতা

মিথ-পুরাণের ব্যবহারে নতুন ব্যঞ্জনা ও অর্থ তৈরি হয়। নজরুলের প্রবন্ধে পৌরাণিক অনুষঙ্গগুলো পুরাণের সাধারণ অর্থের বাইরেও বিশেষ অর্থ ধারণ করেছে। পুরাণের চরিত্র পৌরাণিক কাহিনির এবং একই সঙ্গে বাস্তব ঘটনার প্রতিনিধিত্ব করে। সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা, সমাজ থেকে অন্যায়-অবিচার উৎপাটন করা, এবং দেশ থেকে ঔপনিবেশিক শক্তিকে দূর করার জন্য নজরুল দ্বিবিধ অর্থে মিথ-পুরাণের ব্যবহার করেছেন।

নজরুল মধ্যযুগের পুথিসাহিত্য দ্বারাও প্রভাবিত ছিলেন বলে আবু জাফর উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন:

> নজরুল ইসলামের সাহিত্যে পুঁথি ও পুরাণের প্রভাবের কথা এসে যায় নানা কারণে। অত্যন্ত অল্প বয়স থেকেই সুকঠিন দারিদ্র্য নজরুলকে জীবিকার তাগিদে নামহীন, গোত্রহীন ও ঠিকানাবিহীন অবস্থায় জনারণ্যে মিশে যেতে বাধ্য করেছিল এবং তাতে করে কৈশোর জীবনের ঘাটে ঘাটে যাত্রা, কথকথা, পুঁথিপাঠ, কোরাণপাঠ, রামায়ণ মহাভারতের আবৃত্তি, অভিনয়, লেটো, কীর্তন, কবিগান, জারীগান, সারীগান, ভাওয়াইয়া প্রভৃতির মতো গণজীবনকেন্দ্রিক বিনোদন মাধ্যমগুলির সঙ্গে তাঁর সুনিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। (১৯৯৫: ৬৩)

আবু জাফর (১৯৯৫: ৬৭) আরো উল্লেখ করেছেন, নজরুল হিন্দুপুরাণের এক-একটি চরিত্র কিংবা ঘটনাকে কখনো পৃথকভাবে, কখনো সহজ ভঙ্গিতে একই সঙ্গে অবলীলাক্রমে মুসলিম ঐতিহাসিক চরিত্রের পাশাপাশি রেখে ব্যবহার করেছেন। পঠনপাঠনের গভীরতা এবং লিখনশৈলীর ভঙ্গিমা—এ দুই আত্মবিশ্বাস কাজী নজরুল ইসলামের প্রবন্ধে ধর্ম ও মিথ-পুরাণের ব্যবহার প্রাসঙ্গিক করেছে; একই সঙ্গে বিষয় ও ভাব প্রকাশে এসব শব্দের ব্যবহার দ্ব্যর্থবোধক হয়ে উঠেছে।

অন্নপূর্ণা: জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা দশহাতে করুণা, স্নেহ আর হাসি বিলাচ্ছে দেখলাম। ('মেয় ভুখা হুঁ')

অবতার: অবতার-পয়গম্বর কেউ বলেননি। ('হিন্দু-মুসলমান')

অসুর: যে অসুরের পায়ের ধুলো আমি মাথায় নিই। ('মোরা সবাই স্বাধীন মোরা সবাই রাজা')

আবাবিল: 'আবাবিলের' প্রস্তর-বৃষ্টি হইল না। ('মন্দির ও মসজিদ')

ইন্দ্র: ইন্দ্রের বজ্রে ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি হতে লাগল। ('পথিক! তুমি পথ হারাইয়াছ?')

ইবরাহীম: যেমন 'ইবরাহিমের' পরশে ...। ('আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল')

ইস্রাফিল: ঐ শোনো ইস্রাফিলের শিঙ্গায় নব সৃষ্টির উল্লাস-ঘন রোল! ('নবযুগ')

ঈসা: ঈসা-মুসা-মুহম্মদের মতো মানুষকে! ('মন্দির ও মসজিদ')

কর্ণ: যিনি মহাবীর কর্ণের মতো উচ্চশিরে সর্বসমক্ষে দাঁড়াইয়া বলিতে পারিবেন ('বাঙালির ব্যবসাদারী')

কারবালা: কারবালা-মাতমের মতো মোচড় খাইয়া উঠিল। ('লোকান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য')

কালী: মা কালীর 'প্রেস্টিজ' রক্ষার জন্য ...। ('মন্দির ও মসজিদ')

কাসেম: ঐ শোন কাসেমের অতৃপ্ত আত্মা ফরিয়াদ করে ফিরছে ('মোহর্‌রম')

ক্ষীরোদ সাগর: আজ নারায়ণ আর ক্ষীরোদসাগরে নিদ্রিত নন। ('নবযুগ')

গঙ্গা: দুষ্ট মেয়ে গঙ্গা কলকল কলকল করে হেসে উঠে সব নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে দিলে। ('মেয় ভুখা হুঁ')

চণ্ডী: রণ-চণ্ডীর মহামারির মধ্যে, আমাদের মনুষ্যত্ব জাগে ('গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!')

জাহান্নাম: অন্যে জাহান্নামে যাইবে বলিয়া কি তুমিও তার পিছু পিছু সেখানে যাইবে? ('গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!')

ত্রিশূল: সে যেন ক্ষ্যাপা ভোলানাথের ছোঁড়া ত্রিশূল। ('মেয় ভুখা হুঁ')

দেবতা: কোন অজানা পাষাণ দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া কেবলই কান্না জুড়িয়া দিলাম। ('গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!')

দেবী: পথ হারাই নাই দেবী! ('পথিক! তুমি পথ হারাইয়াছ?')

নমরুদ: 'নমরুদের' জাহান্নাম ফুল হয়ে হেসে উঠেছিল। ('আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল')

নীলকণ্ঠ: নীলকণ্ঠ হবার আগেই ব্যথায় নীলকণ্ঠ হয়ে গেল। ('ক্ষুদিরামের মা')

পাঁঠাকাটা: আমাদের হাজার লোককে পাঁঠাকাটা করিয়া কটিলেও তোমাদের কিছু বলিতে পাইব না? ('মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?')

পূজা: আমি পূজার নই। আমি ঘৃণার। ('আমি সৈনিক')

পূজারী: এই ফাঁকির পূজারীর ক্রন্দনে সত্য জাগে না। ('ধূমকেতুর পথ')

ফাতেমা: মা ফাতেমা আরশের পায়া ধরে কাঁদছেন। ('মোহর্‌রম')

বলরাম: তোমার হাতের এ লাঙল আজ বলরাম-স্কন্ধে হলের মতো ...। ('রুদ্র-মঙ্গল')

বুদ্ধ: একেবারে ত্যাগের চূড়ান্ত করিয়াছে—একেবারে বুদ্ধদেব! ('জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়')

বোধিসত্ত্ব: এতদিনে ভারতের বোধসত্ত্ব বুদ্ধ আঁখি মেলিয়া চাহিলেন। ('নবযুগ')

ভৃগু: ভৃগুর মতো বিদ্রোহী হও ...। ('মোরা সবাই স্বাধীন মোরা সবাই রাজা')

মনসা: মনসার পূজা-বেদীতে তোমাদের সঞ্চিত বিষ উদ্গীরণের আহ্বান এসেছে। ('তুব্ড়ী বাঁশির ডাক')

মুসা: ঈসা-মুসাকে যে সব ধর্ম-মাতাল প্রহার করিয়াছিল ('মন্দির ও মসজিদ')

মোহর্‌রম: ফিরে এসেছে আজ সেই মোহর্‌রম। ('মোহর্‌রম')

যজ্ঞ: যজ্ঞ জ্বলুক ...। ('নবযুগ')

রসূল: রসূলের দিকে চেয়ে দেখ। ('মেহর্‌রম')

রুদ্র: তোমার রুদ্র মূর্তি দিকে দিকে প্রকটিত হউক। ('গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!')

শয়তান: আজ শয়তান বসিয়াছে স্রষ্টার সিংহাসনে। ('মন্দির ও মসজিদ')

শিব: শিবকে জাগাও, কল্যাণকে জাগাও। ('মোরা সবাই স্বাধীন মোরা সবাই রাজা')

সকীনা: সকীনার—অতৃপ্তির আকুল কাঁদন-রণরণি শোনো ...। ('মোহর্‌রম')

স্বর্গ: যাহার হওয়া উচিত ছিল স্বর্গমর্ত্যরে সেতু ('মন্দির ও মসজিদ')

হজরত আলী: হজরত আলীর মাতম শোনো। ('মোহর্‌রম')

## ৫.৩ বাগ্‌ধারা ও প্রবাদ-প্রবচনের প্রয়োগে দ্ব্যর্থবোধকতা

বাগ্‌ধারা ও প্রবাদ-প্রবচন[৩] সাধারণ অর্থের ভিতরে এমনিতেই আরেকটি বিশেষ অর্থ ধারণ করে। কাজী নজরুল ইসলামের গদ্যে প্রচুর পরিমাণে এ ধরনের বিশিষ্টার্থক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

অপূর্বকুমার রায় (২০০৬: ২৯) Jespersen-এর The Philosophy of Grammar (১৯১৯) গ্রন্থের সূত্র ধরে বলেন, শব্দের দুটি রূপ: একটি বহিরঙ্গ রূপ (outward form) এবং অন্যটি অন্তরঙ্গ অর্থ (inner meaning)। ভাষার ভাবপ্রকাশের পদ্ধতি দুটি: ১. একটি পদ্ধতি বহিরঙ্গ রূপ থেকে অন্তরঙ্গ অর্থের অনুসন্ধানে অগ্রসর হয়, এবং অপর পদ্ধতি অন্তরঙ্গ অর্থ থেকে বহিরঙ্গ রূপের অনুসন্ধান করে। বাগ্‌ধারা ও প্রবাদ-প্রবচের ব্যবহারে এটি বেশ ভালোভাবে বোঝা যায়। কারণ, এক্ষেত্রে একটি শব্দ বাইরে থেকে ভেতরে এবং ভেতর থেকে বাইরে—দুইভাবেই অর্থ বা ভাব প্রকাশ করতে পারে।

অঙ্কুরে বিনষ্ট: সে বার জাতীয় বিদ্যালয় অঙ্কুরেই বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল। ('জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়')

একগুঁয়েমি: আমাদের একগুঁয়েমিও আছে। ('জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়')

এক ফুঁয়ে উড়ে যাওয়া: অতএব মি. শাস্ত্রীর কথা এক ফুঁয়ে উড়িয়া গেল! ('কালা আদমীকে গুলি মারা')

এক যাত্রায় পৃথক ফল: তখন স্পষ্টই দেখিতে পাইবেন—'এক যাত্রায় পৃথক ফল!' ('শ্যাম রাখি না কুল রাখি')

কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরা: অধীনতা মানুষের জীবনী-শক্তিকে কাঁচাবাঁশে ঘুণ ধরার মতো ভুয়া করিয়া দেয়। ('আমাদের শক্তি স্থায়ী হয় না কেন?')

কুম্ভকর্ণ: তাহা অপেক্ষা বরং কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভালো। ('ভাব ও কাজ')

গড্ডলিকা প্রবাহ: সেই গড্ডলিকা প্রবাহ ...। ('বাঙ্‌লা সাহিত্যে মুসলমান')

গন্ডারের চামড়া: মানুষের চামড়া কিছু গন্ডারের চামড়া নয়। ('শ্যাম রাখি না কুল রাখি')

গোদের উপর বিষ ফোঁড়া: গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো তদুপরি আবার ...। ('জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়')

ঘুণে ধরা: অস্থিমজ্জায় ঘুণ ধরাইয়া একেবারে নির্বীর্য করিয়া তুলিয়াছে। ('ছুঁৎমার্গ')

চুলোয় যাওয়া: বাকি সব চুলোয় যাক, তাঁহাদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই! ('লাট-প্রেমিক আলি ইমাম')

চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনি: কিন্তু চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনি! বলা বাহুল্য, তাঁহার এ আরজী বাতিল ও না-মঞ্জুর হইয়া গেল। ('কালা আদমীকে গুলি মারা')

ছিনিমিনি খেলা: মুক্তিলাভের জন্য প্রাণ লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছে। ('গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!')

ছেলে ভুলানো: এতদিন মোয়া দেখাইয়া ছেলে ভুলাইয়াছ ...। ('মুখবন্ধ')

জড়-ভরত: জড়-ভরতের মতো বসিয়া থাকা, ইহাই আমাদের প্রাণশক্তিকে টুঁটি টিপিয়া মারিতেছে। ('বাঙ্‌লা সাহিত্যে মুসলমান')

জলে কুমির ডাঙায় বাঘ: যেদিকেই যাও, নিশ্চয়ই মরিতেই হইবে। জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ! ('রোজ-কেয়ামত বা প্রলয়-দিন')

টকের ভয়ে পালিয়ে গিয়ে তেঁতুলতলায় বাসা: কথায় বলে, 'টকের ভয়ে পালিয়ে গিয়ে তেঁতুলতলে বাসা।' ('জাতীয় শিক্ষা')

ত্রিশঙ্কু: তাঁহার এ ত্রিশঙ্কুর মতো অবস্থা দেখিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। ('শ্যাম রাখি না কুল রাখি')

দশচক্রে ভগবান ভূত: 'দশচক্রে ভগবান ভূত' কথাটা মস্ত সত্যি কথা। ('ভাব ও কাজ')

দুই নৌকায় পা দেওয়া: তিনি এখনও প্রাণপণে দু নৌকায় পা দিয়া আছেন বলিলেই হয়। ('শ্যাম রাখি না কুল রাখি')

ন যযৌ ন তস্থৌ: তাঁহার আর এ 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাব চলিবে না। ('শ্যাম রাখি না কুল রাখি')

নিজের পায়ে দাঁড়ানো: ... তবু ব্যবসা-বাণিজ্যে হাত দিব না, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে চেষ্টা করিব না। ('আমাদের শক্তি স্থায়ী হয় না কেন?')

পটল তোলা: যখন সূয্যিমামা পটল তুলিবেন ...। ('রোজ-কেয়ামত বা প্রলয়-দিন')

পোড়া কপাল: ... তোমাদের পোড়া কপালে বাসি ছাইয়ের পাণ্ডুর টিকা পরিয়ে দিতে। ('আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল')

বক-ধার্মিক: যত ছোঁয়া-ছুঁয়ির নীচ ব্যবহার ভণ্ড বক-ধার্মিক ...। ('ছুঁৎমার্গ')

বিড়াল-তপস্বী: আর বিড়াল-তপস্বী দলের মধ্যেই ...। ('ছুঁৎমার্গ')

মাছ দিয়ে শাক ঢাকা: হাজার চেষ্টা করিলেও চাপা দেওয়া যাইবে না; 'মাছ দিয়া শাক ঢাকা যায় না'। ('জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়')

মান্ধাতার আমল: এই মান্ধাতার আমলে বিশ্রী বিধি-বন্ধন ভাঙিয়া চুরমার করিয়া ফেলিতে ...। ('ছুঁৎমার্গ')

মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম: 'মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম', ভুল সকলেরই হয় ... ('জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়')

সাপের ছুঁচো গেলা: ঠিক যেন সাপের ছুঁচো গেলা গোছ। ছাড়িতেও পারেন না, গিলিতেও পারেন না। ('শ্যাম রাখি না কুল রাখি')

## ৫.৪ রূপকথা ও লোককথার অনুষঙ্গে দ্ব্যর্থবোধকতা

কাজী নজরুল ইসলামের প্রবন্ধে রূপকথা ও লোককথার অনুষঙ্গে ব্যবহৃত শব্দের সংখ্যা বেশি নয়। এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, তিনি বাংলার রূপকথা, পুরাণ-কাহিনি ও আরবের কাহিনি ব্যবহার করেছেন। নজরুল-জীবনীকারদের মতে[৪], দারিদ্র্য, কৌতূহল ও জীবনতৃষ্ণা তাঁকে বিচিত্র জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করেছে।

চিচিং ফাঁক: তাহারা 'ঐ রে চিচিং ফাঁক হ'ল' বলিয়া চেঁচাইয়া চিল্লাইয়া ...। ('মুখবন্ধ')

পাতালপুরী: তাহারা দিবারাত্রি খনির নিচে পাতালপুরীতে আলো-বাতাস হইতে নিজেদের বঞ্চিত করিয়া ...। ('ধর্মঘট')

প্রেত: ইহারা মানুষ কি প্রেত-লোক-ফেরতা বীভৎস নর-কঙ্কাল। ('ধর্মঘট')

রাজপুরী: উদাসিনী রাজপুরীর প্রান্তে এসে পড়ল। ('মেয় ভুখা হুঁ')

লখিন্দর: লখিন্দরের মতো দুর্ভেদ্য ছিদ্রহীন দুর্গের মধ্যে থাকলেও ...। ('বিষ-বাণী')

সোনার কাঠি: সাহিত্যকে এই প্রাণের সোনার কাঠি দিয়া জাগাইবার ...। ('বাঙ্‌লা সাহিত্যে মুসলমান')

## ৫.৫ জীবজন্তুর নাম ব্যবহারে দ্ব্যর্থবোধকতা

প্রচুর পরিমাণে পশুর নাম এসেছে নজরুলের প্রবন্ধে। এসব শব্দ শুধু ওই পশু ও তার গুণকে বোঝাচ্ছে না, একইসঙ্গে মানুষ ও মানুষের বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করছে। *ইশপের গল্প* কিংবা বিভিন্ন লোককথা, উপকথা, পুরাণকথায়ও দেখা যায়, জীবজন্তুর মাধ্যমে প্রকারান্তরে মানুষকেই বোঝানো হয়।

কুকুর: পা-চাটা কুকুরের মতো মুখে লাথি মারুক? ('গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!')

খ্যাঁকশিয়াল: ... অন্তরে তাহারা খ্যাঁকশিয়ালীর চেয়েও ভীরু। ('মুখবন্ধ')

গরু: গরু-ছাগল নিয়ে করে ... ('হিন্দু-মুসলমান')

গাধা: লুকানো গর্দভ-মূর্তি বাহির হইয়া পড়িবেই। ('গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!')

ছাগল: ... এবং আমলাতন্ত্র হইতেছেন ছাগল! ('মুখবন্ধ')

তক্ষক: আমরা তক্ষক হয়ে ... দংশন করি। ('বিষ-বাণী')

নেকড়ে বাঘ: নেকড়ে বাঘের হিংস্র আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইব না ('গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!')

বাঁদর: সমুদ্রপারের বুনো বাঁদরের মতো লাল! ('মন্দির ও মসজিদ')

বাঘ: শৃঙ্গহীন বাঘ-ভালুকের দলে। ('হিন্দু-মুসলমান')

বাদুড়: ইহারা হইয়া পড়িয়াছেন বাদুড়ের মতন ('বাঙালির ব্যবসাদারী')

বিড়াল: তুমি কী চাও?—কুকুর-বিড়ালের মতো ঘৃণ্য-মরা মরিতে ... ('গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!')

ভল্লুক: ব্যাঘ্র-ভল্লুক জাতীয় পশুগুলো বেশি হিংস্র। ('হিন্দু-মুসলমান')

মহিষ: শিংওয়ালা গরু-মহিষের চেয়ে ...। ('হিন্দু-মুসলমান')

মেষ: নির্বোধ মেষ-যূথের মতো এক স্থানে জড় হইয়া শুধু মাথাটা লুকাইয়া থাকিলে ('গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!')

সিংহ: সিংহের চামড়ার মধ্য হইতে ('গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!')

শকুন: ঐ দেখ শকুন—মড়ার পচা মাংস নিয়ে টানাটানি খাওয়া-খাওয়ি করছিল। ('স্বাগত')

শূকর: শূকরকে খোঁচাইয়া মারে। ('মন্দির ও মসজিদ')

শিয়াল: শিয়াল-কুকুরের আড্ডা ('মন্দির ও মসজিদ')

সাপ: সাপ লইয়া খেলা করিতে গেলে ... ('ভাব ও কাজ')

## ৫.৬ কাব্যিক শব্দে দ্ব্যর্থবোধকতা

কবি নজরুলের গদ্যভাষায় প্রচুর কাব্যভাষার নমুনা পাওয়া যায়। কাব্যভাষা প্রায়শ দ্ব্যর্থবোধক হয়। ফলে, গদ্যভাষাতেও কাব্যভাষার শব্দ একাধিক অর্থ তৈরি করেছে।

সুফী জুল্‌ফিকার হায়দার (১৯৬৯: ৩৩) লিখেছেন, নজরুল মনে করতেন, তারুণ্যের শক্তিই পারে সবকিছু বদলে দিতে। কবি 'জরায় আবৃত' তরুণ সমাজকে দেখতে চাননি, তাদের মধ্যে দেখতে চেয়েছেন 'জীবনের উজ্জ্বলতা ও প্রাণৈশ্বর্য'। সমাজে জীবন ও যৌবনের জোয়ার আনতে, সব ধরনের ভীরুতা থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে এবং প্রত্যেকের মনকে উন্মুক্ত করে বৃহৎকে গ্রহণ করতে যে শক্তি প্রয়োজন, তাকে ভাষা দিয়ে উদ্বোধিত করতে চেয়েছেন নজরুল। কাব্যিক দ্ব্যর্থকতা যে কারণে তাঁর গদ্যভাষারও অবলম্বন হয়েছে।

চিরকিশোর: ভারতে শুধু চিরকিশোর মানুষেরই জয় হউক ('ছুঁৎমার্গ')। এখানে 'চিরকিশোর' শব্দটি দিয়ে বয়স নয়, বরং উদ্দামতাকে বোঝানো হয়েছে।

বোধন-বাঁশি: এসো, আমাদের উপেক্ষিত ভাইদের হাত ধরিয়া আজ ভারত-বেদীর সামনে দাঁড়াইয়া বোধন-বাঁশিতে সুর দিই ('উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন')।

পাপড়ি খোলা: শরম-রাঙা পাপড়ি কটি তোমার খুলে দাও—ছড়িয়ে দাও ('জাগরণী')। 'পাপড়ি খোলা' শব্দ একইসঙ্গে ফুলের ফোটা এবং বাঙালির জাগরণ—দুইই বোঝানো হচ্ছে।

মলাট: আমি লাটের মলাটে নিজের নাম লিখাইতে রাজি হই নাই (লাট-প্রেমিক আলি ইমাম)। অনুপ্রাস তৈরির মাধ্যমে সৃষ্ট শব্দটি তালিকা ও অধীনতা অর্থ প্রকাশ করছে।

লক্ষ্মীছাড়া: এসো আমার লক্ষ্মীছাড়ার দল! ('আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল')। উচ্ছৃঙ্খল ও বিপ্লবী দু ধরনের অর্থই জ্ঞাপন করছে।

## ৫.৭ তুলনায় দ্ব্যর্থবোধক শব্দ

বিষয় ও ভাবপ্রকাশের বাহন হিসেবে তুলনার কাজটি বারবার এসেছে। তুলনার ক্ষেত্রে কখনো কখনো শব্দের বদলে বাক্য ব্যবহার করেছেন। যেমন, জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: 'এ সবই ইংরেজি কায়দা-কানুনকে যেন মাথায় পগ্‌গ ও পায়ে নাগরা জুতা পরাইয়া এদেশী করা; অথবা সাহেবকে ধুতি ও মেমকে শাড়ি পরাইয়া বাবু ও বিবি সাজানো গোছ' ('জাতীয় শিক্ষা')। প্রবন্ধ থেকে তুলনাবাচক শব্দের দ্ব্যর্থবোধকতার নমুনা:

আখের কল: আখের কল আখকে নিঙ্‌ড়াইয়া পিষিয়া যেমন শুধু তাহার শুষ্ক ছ্যবা বাহির করিয়া দিতে থাকে ('আমাদের শক্তি স্থায়ী হয় না কেন?')। অধীনতাকে লেখক আখের কলের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

কর্পূরের মতো: সে ভাবাবেশ কর্পূরের মতো উড়িয়া যায়। ('ভাব ও কাজ')

জোঁকের মতো: সমস্ত কিছু জোঁকের মতো শোষণ করিতে থাকে ('আমাদের শক্তি স্থায়ী হয় না কেন?')। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজশক্তিকে জোঁকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

শৃগাল: নীল শৃগালের ধূর্তামি বেশি দিন টিকিবে না। ('গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!')

শোলার আগুনের মতো: শোলার আগুনের মতো জ্বলিয়া নিভিয়া ছাই হইয়া যায়। ('আমাদের শক্তি স্থায়ী হয় না কেন?')

সাপের মতো: এমন দলিত সর্পের মতো গর্জিয়া উঠিতে পারিত? ('ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ')

সোডা ওয়াটারের মতো: সোডা ওয়াটারের মতো আমাদের শক্তি ('আমাদের শক্তি স্থায়ী হয় না কেন?')। ভারতবাসীর আন্দোলনের ধরন বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

## ৬ দ্ব্যর্থবোধক শব্দের প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য

মূলত প্রতিবাদের ভাষা হিসেবেই কাজী নজরুল ইসলাম দ্ব্যর্থবোধক শব্দের ব্যবহার করেছেন। দ্ব্যর্থবোধক শব্দের ব্যবহারে বক্তব্যের জোর প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। উপনিবেশবিরোধী বক্তব্য এসব প্রবন্ধের মূল কথা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি অর্থনীতি, ধর্ম ও সাহিত্য নিয়ে কথা বলেছেন। দ্ব্যর্থবোধক শব্দগুলোর ব্যবহার লেখকের যতটুকু না সচেতন-প্রয়াস, তার চেয়ে বেশি তাঁর ভাষাগত বিশেষত্বের প্রমাণ।

দ্ব্যর্থবোধক শব্দের প্রয়োগে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুই রকম অর্থই সমানভাবে ক্রিয়াশীল থেকেছে। তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অর্থ প্রধান হয়েছে। যেমন: এমনই জল্লাদ-কসাই-এর আবির্ভাব মস্ত বড়ো মঙ্গলের কথা ('ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ')। এখানে ইংরেজ সেনানায়ক ডায়ারকে 'জল্লাদ-কসাই' হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং 'মঙ্গল' শব্দ দিয়ে এর দ্বিতীয় অর্থ 'অমঙ্গল' নির্দেশ করেছেন।

এ ধরনের শব্দের প্রয়োগে ভাষা শিথিল হয়ে পড়েছে কোনো কোনো জায়গায়। যেমন: 'আবার শিব মোচড় খেয়ে উঠল, কিন্তু শব তার বুকে চেপে' ('পথিক! তুমি পথ হারাইয়াছ?')। এখানে অনুপ্রাস সৃষ্টির অকারণ প্রয়াসে ভাবের প্রকাশ শিথিল হয়ে পড়েছে।

সাদৃশ্যের ভিত্তিতে নতুন শব্দও তৈরি করতে হয়েছে নজরুলকে। যেমন: 'তাঁহারা যে সব বুদ্ধির পরিচয় দিতেছেন, তাহার সকলগুলির পরিচয় দিতে হইলে একটি সপ্তকাণ্ড "আমলায়ন" লিখিতে হয়।' 'রামায়ণে'র সাথে মিলিয়ে 'আমলায়ন' শব্দ তৈরি হয়েছে। নতুন সৃষ্ট শব্দটি একইসঙ্গে একটি কাল্পনিক গ্রন্থকে নির্দেশ করে এবং বিবৃতিও বোঝায়।

কিছু কিছু শব্দের দ্ব্যর্থ ব্যবহার নজরুলের কাব্যে যেমন বারবার এসেছে, গদ্যেও তেমনি শব্দগুলো দ্ব্যর্থবোধকভাবে বারবার এসেছে; যেমন—শিব, ভৃগু, মঙ্গল ইত্যাদি শব্দ।

ভাষার ব্যবহারের সঙ্গে সমাজভাষিক সূত্র নিবিড়ভাবে কাজ করে। মৃণাল নাথ (১৯৯৯: ৩৫) লিখেছেন: 'সমাজে মানুষকে বাস করতে হলে তাকে যেমন সমাজের কিছু নিয়ম বা অনুশাসন মেনে চলতে হয়; সমাজে মানুষের ভাষার ব্যবহারও তেমনি কিছু নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এ সমস্ত ব্যাকরণের বাইরে, ভাষা ব্যবহারের সামাজিক নিয়ম।'

মৃণাল নাথ (১৯৯৯: ৩৫) শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরভিন-ট্রিপের (১৯৭১) তিনটি সূত্র উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো: ১. বিকল্প সূত্র (Alternation Rules), ২. পারম্পর্য সূত্র (Sequencing Rules) এবং ৩. সঙ্গতি সূত্র (Co-occurrence Rules)। প্রকাশের জন্য যখন একাধিক শব্দ হাতের কাছে থাকে, তখন বক্তা বা লেখক বিকল্প সূত্র ব্যবহার করে। আবার, একটি ভাব ও শব্দের পরম্পরায় যখন আরেক ভাব বা শব্দ আগমন করে, তখন তাকে বলে পারম্পর্য সূত্র। আর শব্দপ্রয়োগে অস্বাভাবিকতা বর্জন করে সঙ্গতি বজায় রাখার নাম সঙ্গতি সূত্র।

ভাষা ব্যবহারকারী অবশ্য অসচেতনভাবে উপরের তিনটি সূত্রকেই কাজে লাগিয়ে থাকেন। কাজী নজরুল ইসলামের গদ্যেও দেখা যাবে, অনেক বিকল্পের মধ্যে একটিকে গ্রহণ করছেন। যেমন—শেয়াল, শকুন কিংবা বাঘ, সিংহ এ রকম গুচ্ছ থেকে একটি শব্দ দ্ব্যর্থবোধক অর্থে বেছে নিচ্ছেন। আবার কথার সূত্র ধরে উদাহরণ বা যুক্তি প্রকাশে তিনি নতুন ব্যঞ্জনাত্মক শব্দ ব্যবহার করছেন। এখানে স্বাভাবিক পারম্পর্যকে প্রায় অস্বীকার করে তিনি এমন প্রয়োগ করেন, যা শব্দ সম্পর্কে পাঠককে বিস্মিত করে এবং সংশ্লিষ্ট পাঠে পাঠককে আগ্রহী করে তোলে। সঙ্গতির ক্ষেত্রেও নজরুলের গদ্যভাষায় ভাব্যের প্রাবল্য লক্ষ করা যায়।

## ৭ উপসংহার

কাজী নজরুল ইসলামের প্রবন্ধের বক্তব্য ব্রিটিশ সরকারের চোখে 'রাষ্ট্রবিরোধী' ও 'রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক'। তাই তিনটি প্রবন্ধগ্রন্থই বাজেয়াপ্ত হয়। অধিকাংশ প্রবন্ধের বক্তব্য ও ভাষা অত্যন্ত স্পষ্ট ও আক্রমণাত্মক। কবি নজরুলের কাব্যভাষার জোর তাঁর প্রবন্ধের ভাষাকে প্রভাবিত করেছে। দ্ব্যর্থবোধক শব্দগুলো কোনো ধোঁয়াশা বা অস্পষ্টতা তৈরি করেনি, বরং বক্তব্যে শক্তি জুগিয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধের সূত্র ধরে বলা যায়, নজরুলের কাব্যভাষা ও গদ্যভাষায় তুলনার মধ্য দিয়ে এই আলোচনা আরো সুনির্দেশিত হতে পারত।

তবে শব্দের যত প্রকাশশক্তিই থাক, তারও কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। জে ভি স্তালিন কমরেড ইক্রাসেনন নিকোভার একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন—

> ... অন্যদিকে তাদের মধ্যে [ভাষা ও উৎপাদন-যন্ত্র] একটা মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। সেই প্রভেদটি হল—যন্ত্র যেখানে বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদন করে, সেখানে ভাষা কিছুই উৎপাদন করে না কিংবা কেবলমাত্র শব্দ 'উৎপাদন' করে। আরও সহজভাবে বলতে গেলে যা দাঁড়ায় তা হল—যে জাতির উৎপাদন-যন্ত্র আছে—সেই জাতি বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদন করতে পারে। কিন্তু সেই জাতিরই যদি নিজস্ব একটা ভাষা থাকে অথচ কোন উৎপাদন-যন্ত্র না থাকে তাহলে সেই জাতি বৈষয়িক সম্পদ উৎপন্ন করতে পারে না। (১৯৮৯: ৩১)

অর্থাৎ, শব্দরাজি শেষ পর্যন্ত কোনো আর্থিক উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত হয় না; ফলে তা সাধারণ মানুষের ভাগ্যও বদল করতে পারে না। কিন্তু তাই বলে ভাষার শিল্প ও সাহিত্যগুণকে অস্বীকার করারও উপায় নেই।

**টীকা**

১. প্রবন্ধগ্রন্থ তিনটির প্রকাশকাল খুব সুনির্দিষ্ট নয়। আবদুল কাদির-সম্পাদিত নজরুল-রচনাবলীর (১৯৯৩) নতুন সংস্করণের প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টে উল্লেখ করা হয়েছে, *যুগবাণী* প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালের অক্টোবরে। বাকি দুটি গ্রন্থের ব্যাপারে দ্বিধা আছে—*দুর্দিনের যাত্রী* ১৯২৬ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত হয়ে বলে রফিকুল ইসলাম নির্দেশ করেছেন; আর *রুদ্র-মঙ্গল* গ্রন্থের প্রকাশকাল সম্ভবত ১৯২৭। *রাজবন্দীর জবানবন্দী* 'ধূমকেতু'র মামলায় আদালতে দাখিল করা হয়েছিল। এটি *ধূমকেতু* (১৯২২) ছাড়াও একই বছরে আরো অন্তত তিনটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। (আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য ১৯৯৩: ৯৩৩-৯৩৫)

২. 'নবযুগ' পত্রিকার পরিচালক ছিলেন এ কে ফজলুল হক। সম্পাদকীয় বিভাগে আরো অনেকের সঙ্গে মুজাফ্ফর আহমদও ছিলেন। (খান মুহাম্মদ ১৯৭৮: ১৭)

৩. বাগ্‌ধারা ও প্রবাদ-প্রবচন মূলত কথ্য বাগ্‌ভঙ্গি, প্রমিত লেখ্যরীতিতে এর ব্যবহার কম। তবে এই বিশিষ্টার্থক বাগ্‌ভঙ্গি যখন লেখার ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তখন তার দরুন লিখিত ভাষা গতি লাভ করে। নজরুলের গদ্যে বাগ্‌ধারা ও প্রবাদের ব্যবহার তাঁর গদ্যকে গতিশীল এবং শব্দ ও শব্দগুচ্ছের অর্থকে দ্বিধারী করেছে।

৪. 'পরিবারের দারিদ্র্যের চাপে নজরুলের বিদ্যাশিক্ষার সুব্যবস্থা হয় নি। তিনি গ্রামের মক্তবে পড়াশুনো আরম্ভ করেন। তাঁর প্রখর বুদ্ধি ও মেধা ছিল। তাঁর জ্ঞানপিপাসা শুধু বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকেই সীমাবদ্ধ থাকত না। যেখানে কীর্তন হত, কথকতা হত, যাত্রাগান হত, মৌলবীর কোরাণ পাঠ ও ব্যাখ্যা হত, দুরন্ত বালক গভীর আগ্রহ ও মনোযোগের সঙ্গে সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন। বাউল, সুফী, দরবেশ ও সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গ ভাবে মিশতেন।' (সুশীলকুমার ১৯৯৭: ৩৩)

**সহায়কপঞ্জি**


অপূর্বকুমার রায় (১৯৮৯)। *শৈলীবিজ্ঞান*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং

আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য (১৯৯৩)। *নজরুল-রচনাবলী* প্রথম খণ্ড (সম্পাদিত)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

আবু জাফর (১৯৯৫)। *সাহিত্যে সমাজ ভাবনা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

কলিম খান (২০০১)। *পরমভাষার সংকেত: ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি ও ভাষাতত্ত্বের নতুন দিগন্ত*। ঢাকা: প্যাপিরাস

খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন (১৯৭৮)। *যুগস্রষ্টা নজরুল*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

জে ভি স্তালিন (১৯৮৯)। *মার্কসবাদ ও ভাষাবিজ্ঞানের সমস্যা*। ঢাকা: গণ-প্রকাশন

মৃণাল নাথ (১৯৯৯)। *ভাষা ও সমাজ*। কলকাতা: নয়া উদ্যোগ

সন্‌জীদা খাতুন (২০২৩)। *ধ্বনি থেকে কবিতা*। ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী

সুফী জুল্‌ফিকার হায়দার (১৯৬৯)। *বিদ্রোহী নজরুল নীরব আজি*। ঢাকা: আর্ট এন্ড কালচার

সুশীলকুমার গুপ্ত (১৯৯৭)। *নজরুল-চরিতমানস*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং

স্টিফেন উলম্যান (১৯৯৩)। *শব্দার্থবিজ্ঞানের মূলসূত্র* (জাহাঙ্গীর তারেক অনূদিত)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

হুমায়ুন আজাদ (১৯৯৯)। *অর্থবিজ্ঞান*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী